



সাহিত্য পাড়ি লিখতে শিখি

• ১ম পরিচ্ছেদ

কবিতা

কবিতা পাড়ি ১

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি সব বয়সের মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা ও গান রচনা করতে পারতেন। নিচে কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা দেওয়া হলো।

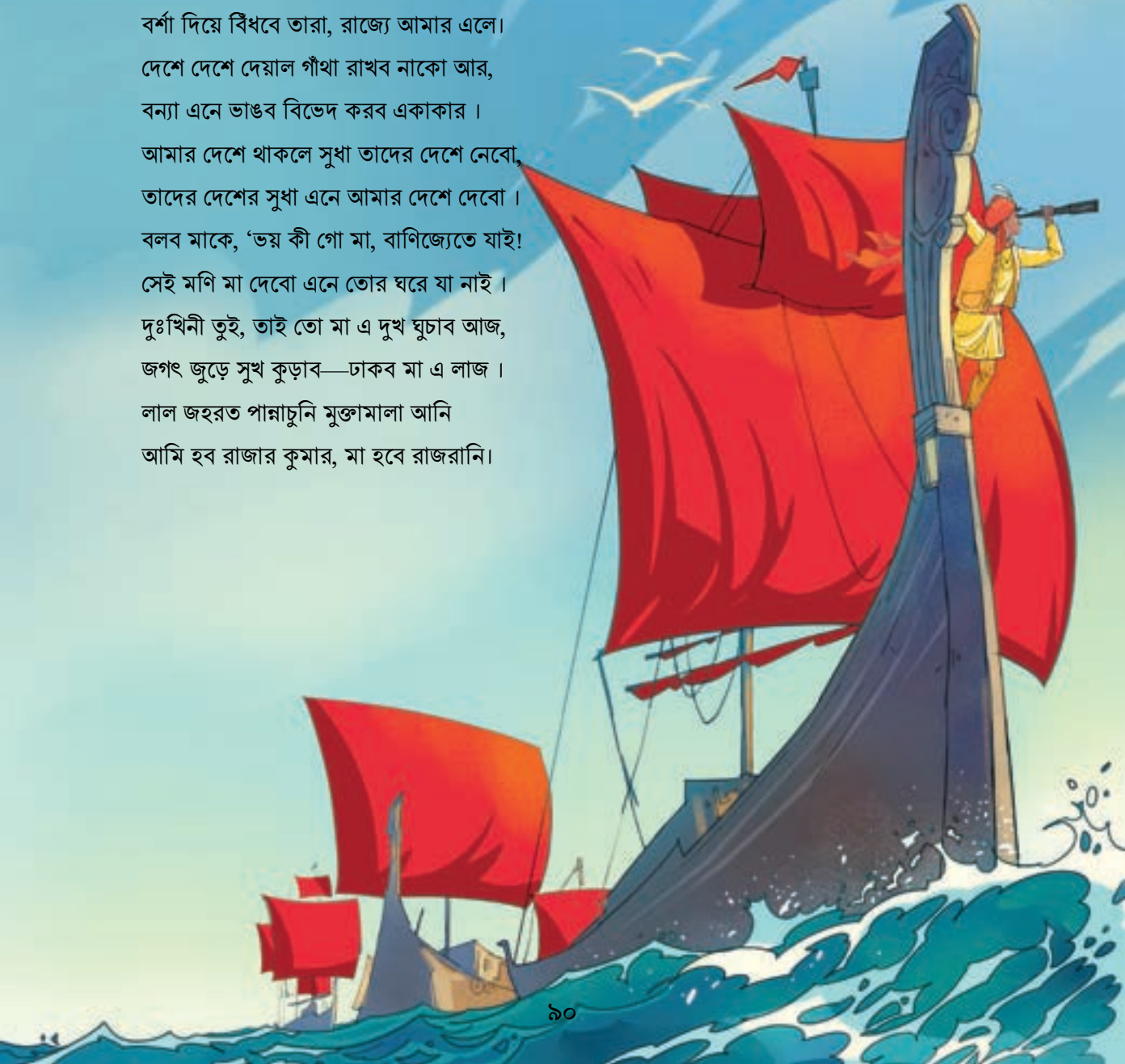
কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

আমি সাগর পাড়ি দেবো

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খি বজরা আমার ‘লাল বাওটা’ তুলে
ঢেউ-এর দোলায় মরাল সম চলবে দুলে দুলে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হয়ে রতন মানিক তার
আমার তরি বোঝাই করে দেবে উপহার।
দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় রাখবে পেতে থানা,
শুক্তি দেবে মুক্তমালা আমারে নজরানা।
চারপাশে মোর গাংচিলেরা করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

আসবে হাঙর কুমির তিমি—কে করে তায় ভয়;
 বলব, ‘ওরে, ভয় পায় যে—এ সে ছেলেই নয়।’
 সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, আমি বণিক বীর,
 খাজনা জোগায় রাজ্যে আমার হাজার নদীর নীর।
 ভয় করি না তোদের দুটো দন্ত নখর দেখে,
 জল-দস্যু, তোদের তরে পাহারা গেলাম রেখে
 সিন্ধু-গাজি মালামাঝি, নৌ-সেনা ঐ জেলে,
 বর্শা দিয়ে বিধবে তারা, রাজ্যে আমার এলে।
 দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা রাখব নাকো আর,
 বন্যা এনে ভাঙব বিভেদ করব একাকার।
 আমার দেশে থাকলে সুখা তাদের দেশে নেবো,
 তাদের দেশের সুখা এনে আমার দেশে দেবো।
 বলব মাকে, ‘ভয় কী গো মা, বাগিজেতে যাই!
 সেই মগি মা দেবো এনে তোর ঘরে যা নাই।
 দুঃখিনী তুই, তাই তো মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
 জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব—ঢাকব মা এ লাজ।
 লাল জহরত পান্নাচুনি মুক্তামালা আনি
 আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরানি।



শব্দের অর্থ

খাজনা :	কর।
গাংচিল :	পাখির নাম।
চুনি :	মূল্যবান পাথর।
জলদস্যু :	যারা সমুদ্রে ডাকাতি করে।
জহরত :	মূল্যবান পাথর।
তরি :	নৌকা।
থানা :	আস্তানা।
দন্ত :	দাঁত।
নখর :	নখ।
নজরানা :	উপহার।
নীর :	পানি।
নৌ-সেনা :	নৌবাহিনীর সদস্য।
পাড়ি দেওয়া :	পার হওয়া।
পান্না :	মূল্যবান পাথর।

বণিক :	ব্যবসায়ী।
বাণিজ্য :	ব্যবসা।
বিভেদ :	পার্থক্য।
ময়ূরপঙ্খি বজরা :	সামনের দিকে ময়ূরের আকৃতিযুক্ত বড়ো নৌকা।
মরাল :	রাজহাঁস।
লাল বাওটা :	লাল রঙের পাল।
সওদাগর :	বড়ো ব্যবসায়ী।
সপ্ত মধুকর :	বাণিজ্যতিরির নাম।
সিন্ধু :	সাগর।
সিন্ধু-গাজি :	সাগরের বীর।
সুখা :	এক ধরনের পানীয়।
শুক্তি :	ঝিনুক।
হাতছানি :	হাত দিয়ে ইশারা করা।
সওদা :	পণ্য।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। এই কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘আমি সাগর পাড়ি দেবো’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

‘আমি সাগর পাড়ি দেবো’ কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

মিল-শব্দ খুঁজি

ছড়া-কবিতায় এক লাইনের শেষ শব্দের সাথে পরের লাইনের শেষ শব্দের মিল থাকে। যেমন: সওদাগর-মধুকর, ঘাটে-হাটে, তুলে-দুলে ইত্যাদি। তোমরাও এভাবে মিল-শব্দ তৈরি করতে পারো। নিচে কিছু শব্দ দেওয়া হলো। এগুলোর এক বা একাধিক মিল-শব্দ লেখো।

শব্দ	মিল-শব্দ
১. ঘাট	
২. কেনা	
৩. রতন	
৪. দোলা	
৫. তার	
৬. আশা	
৭. দেশ	
৮. ভয়	
৯. হাজার	
১০. তোর	
১১. করব	
১২. দেয়াল	

এভাবে যে কোনো শব্দের মিল-শব্দ তৈরি করা যায়। তোমরা এবার জোড়ায় জোড়ায় মিল-শব্দের খেলা খেলতে পারো। একজন উপরের বারোটি শব্দের বাইরে যে কোনো একটি শব্দ বলবে; অন্যজন সেটির মিল-শব্দ বানাবে।

কবিতা পড়ি ২

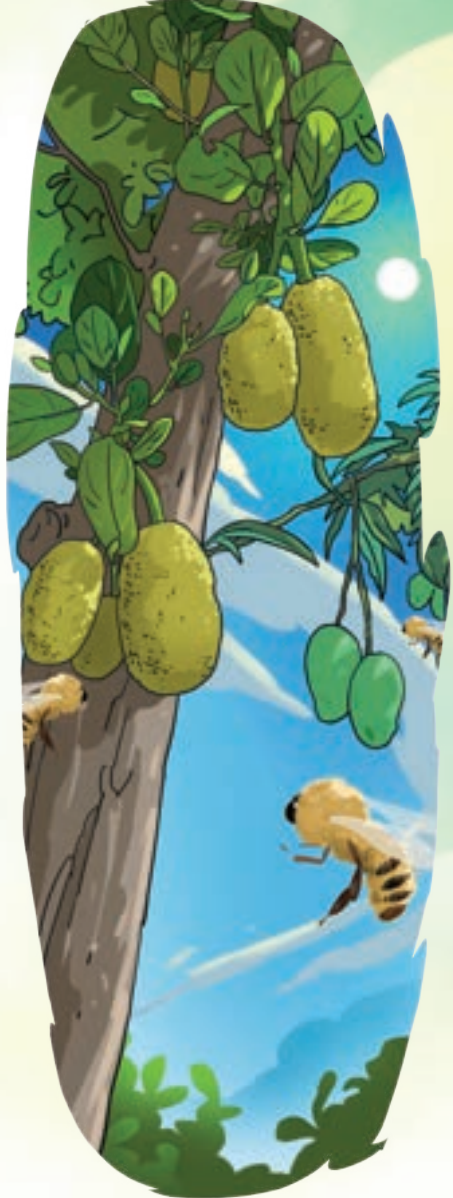
জসীমউদ্দীন পল্লিকবি নামে পরিচিত। তিনি পল্লির জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। নিচের কবিতাটি তাঁর ‘হাসু’ নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

আমার বাড়ি

জসীমউদ্দীন

আমার বাড়ি যাইও ভোমর
বসতে দেবো পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেবো
শালি ধানের চিড়ে।
শালি ধানের চিড়ে দেবো
বিনি ধানের খই,
বাড়ির গাছের কবরি কলা
গামছা-বঁধা দই।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাত।
গাই দোহনের শব্দ শুনি
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় লয়ে
করব আমি খেলা।
আমার বাড়ি ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি,
কাজলা দিঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি।
আমার বাড়ি যাইও ভোমর
এই বরাবর পথ,
মৌরি ফুলের গন্ধ শুঁকে
খামিও তব রথ।



শব্দের অর্থ

আঁচল :	শাড়ির শেষ ভাগ।	তব :	তোমার।
কবরি কলা :	দেশি জাতের কলা।	পিড়ে :	কাঠের তৈরি ছোটো ও নিচু আসন।
কাজলা দিঘি:	যে দিঘির পানি দেখতে কালো মনে হয়।	বিম্বি ধান :	ধানের নাম।
গাই দোহন :	গোরুর দুধ দোয়ানো।	ভোমর :	ভ্রমর; মধুপায়ী এক রকমের পোকা।
গামছা-বীধা দই :	জমাট দই।	মোরি ফুল :	ফুলের নাম।
জলপান :	হালকা নাশতা।	রথ :	এক ধরনের বাহন।
		শালি ধান :	ধানের নাম।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘আমার বাড়ি’ কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘আমার বাড়ি’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

‘আমার বাড়ি’ কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

কবিতায় শব্দের পরিবর্তন

কবিতায় অনেক সময়ে শব্দের চেহারায় কিছু পরিবর্তন হয়। ছন্দ মেলাতে গিয়ে কবিরা সাধারণত এটি করে থাকেন। ‘আমার বাড়ি’ কবিতা থেকে এমন কিছু শব্দের তালিকা দেওয়া হলো:

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
যাইও	যেয়ো
ভোমর	ভ্রমর
পিড়ে	পিড়ি
চিড়ে	চিড়া
শুয়ো	শুয়ে থেকো
পাতি	পেতে
শব্দ শুন	শব্দ শুনে
লয়ে	নিয়ে
ভাসি	ভেসে
তব	তোমার

কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর

কবিতায় যে বর্ণনা থাকে, তাকে গদ্যে রূপান্তর করা যায়। ‘আমার বাড়ি’ কবিতা থেকে এ রকম একটি বিবরণ তৈরি করা হলো:

বন্ধু, তুমি আমার বাড়িতে বেড়াতে এসো। বসার জন্য তোমাকে পিড়ি পেতে দেবো। নাশতা হিসেবে শালি ধানের চিড়া ও বিন্দি ধানের খই দেবো। সাথে দেবো কবরি কলা আর গামছা-বঁধা দই। আম-কাঁঠাল ঘেরা গাছের ছায়ায় আঁচল পেতে শুয়ে থেকো। গাছের শাখা দুলিয়ে তোমাকে বাতাস করব। সকালবেলা তোমার ঘুম ভাঙবে গোরুর দুধ দোয়ানোর শব্দ শুনে। সারাদিন আমি তোমার সঙ্গে খেলা করব। আমার বাড়ির ডালিম গাছে ডালিম ফুল ফোটে। কাজলা দিঘির জলে হাঁস সাঁতার কাটে। আমার বাড়িতে যাওয়ার সোজা রাস্তা আছে; যেখানে মৌরি ফুল ফোটে, সেখানে গিয়ে তোমার গাড়ি থামিয়ে।

কবিতা পড়ি ৩

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের প্রধান কবিদের একজন। তিনি ছোটোদের জন্য কয়েকটি কবিতার বই লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে আছে ‘এলাটিং বেলাটিং’, ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো’, ‘গোলাপ ফোটে খুকির হাতে’, ‘রংধনুর সঁকো’ ইত্যাদি। নিচের ‘বাঁচতে দাও’ কবিতাটি কবির ‘রংধনুর সঁকো’ নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

বাঁচতে দাও

শামসুর রাহমান

এই তো দ্যাখো ফুলবাগানে গোলাপ ফোটে,
ফুটতে দাও।

রঙিন কাটা ঘুড়ির পিছে বালক ছোটে
ছুটতে দাও।

নীল আকাশের সোনালি ঢিল মেলছে পাখা,
মেলতে দাও।

জোনাক পোকা আলোর খেলা খেলছে রোজই,
খেলতে দাও।

মধ্য দিনে নরম ছায়ায় ডাকছে ঘুঘু,
ডাকতে দাও।

বালির ওপর কত্ত কিছু ঐকছে শিশু
ঐকতে দাও।

কাজল বিলে পানকৌড়ি নাইছে সুখে,
নাইতে দাও।

গহিন গাঙে সুজন মাঝি বাইছে নাও,
বাইতে দাও।

নরম রোদে শ্যামা পাখি নাচ জুড়েছে,
নাচতে দাও।

শিশু, পাখি, ফুলের কুঁড়ি—সবাইকে আজ
বাঁচতে দাও।

শব্দের অর্থ

কাজল বিল : যে বিলের পানি কালো
দেখায়।

কাটা ঘুড়ি : যে ঘুড়ির সুতা ছিঁড়ে গেছে।

গহিন গাঙ : বিশাল নদী।

জোনাক : জোনাকি।

নাইতে : গোসল করতে।

পানকৌড়ি : কালো রঙের মাছ-শিকারি
পাখি।

শ্যামা : পাখির নাম।

সুজন মাঝি : দরদি মাঝি।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘বাঁচতে দাও’ কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।



বুঝে লিখি

‘বাঁচতে দাও’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

‘বাঁচতে দাও’ কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

তালে তালে পড়ি

‘বঁচতে দাও’ কবিতাটি সবাই মিলে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পড়ো। যেখানে যেখানে তালি পড়ছে, সেখানে সেখানে বাঁকা দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। পড়ার সময়ে এটা খেয়াল করো।

/এই তো দ্যাখো /ফুলবাগানে /গোলাপ ফোটে, /ফুটতে দাও।

/রঙিন কাটা /ঘুড়ির পিছে /বালক ছোটে, /ছুটতে দাও।

/নীল আকাশের /সোনালি চিল /মেলছে পাখা, /মেলতে দাও।

/জোনাক পোকা /আলোর খেলা /খেলছে রোজই, /খেলতে দাও।

/মধ্য দিনে /নরম ছায়ায় /ডাকছে ঘুঘু, /ডাকতে দাও।

/বালির ওপর /কত্ত কিছু /আঁকছে শিশু /আঁকতে দাও।

/কাজল বিলে /পানকৌড়ি /নাইছে সুখে, /নাইতে দাও।

/গহিন গাঙে /সুজন মাঝি /বাইছে নাও, /বাইতে দাও।

/নরম রোদে /শ্যামা পাখি /নাচ জুড়েছে, /নাচতে দাও।

/শিশু, পাখি, /ফুলের কুঁড়ি—/সবাইকে আজ /বঁচতে দাও।

কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

উপরে তিনটি কবিতা পড়েছ। এই কবিতাগুলোর সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

কবিতা কী

মনের ভাব সুন্দর ভাষায় ছোটো ছোটো বাক্যে যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাকে কবিতা বলে। কবিতায় সাধারণত পরপর দুই লাইনের শেষে মিল-শব্দ থাকে। কবিতা তালে তালে পড়া যায়। কবিতায় লাইনগুলো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হয়। কবিতার ভাষা গদ্যের ভাষার চেয়ে আলাদা। অনেক সময়ে শব্দের চেহারাতেও কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের কবি বলে।

কবিতা লিখি

যে কোনো বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা যায়। মনের কোনো একটা ভাব বা আবেগ কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। এই ভাব বা আবেগ সুখের হতে পারে, দুঃখের হতে পারে, বিস্ময়ের হতে পারে, এমনকি কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসারও হতে পারে। যেমন—কোনো ঘটনা যদি তোমাকে আনন্দ দেয়, কোনো কিছু হারানোর বেদনা যদি তোমাকে কষ্ট দেয়, কিছু দেখে যদি তুমি অবাক হও বা বিস্মিত হও, কিংবা যে কোনো কিছুর জন্য যদি তুমি ভালোবাসা অনুভব করো, তবে সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে পারো।

নিচে কিছু ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে। এই ফাঁকা জায়গায় তুমি নিজে বানিয়ে বানিয়ে একটি কবিতা লেখো। কবিতাটি হতে পারে চার, আট বা বারো লাইনের। কবিতা লেখার সময়ে কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রেখো। কবিতার একটি নাম দাও।

যাচাই করি

তোমার লেখা কবিতায় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না, যাচাই করে দেখো।

১. পরপর দুই লাইনের শেষে মিল-শব্দ আছে কি না।
২. তালে তালে পড়া যায় কি না।
৩. লাইনগুলো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কি না।
৪. এর ভাষা গদ্যের ভাষার চেয়ে আলাদা কি না।
৫. শব্দের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না।

একজনের লেখা কবিতা অন্যকে পড়তে দাও। প্রত্যেকের কবিতা নিয়ে পরস্পর মত বিনিময় করো।

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সেরা কবি। তিনি কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক-সহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় অবদান রেখেছেন। ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর লেখা ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

তোমাদের পড়ার জন্য নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান দেওয়া হলো। গানটি তাঁর ‘রাজা’ নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমরা সবাই রাজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।

আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বঁধা নই দাসের রাজার দ্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।

রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।

আমরা চলব আপন মতে,
শেষে মিলব তারি পথে।
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা॥

শব্দের অর্থ

চরি: ঘুরে বেড়াই।

ত্রাস: ভয়।

দাসত্ব: পরাধীনতা।

বিফলতা: ব্যর্থতা।

বিষম আবর্ত: ভীষণ ঘূর্ণিপাক।

মোদের: আমাদের।

রাজত্ব: রাজ্য।

সনে: সাথে।

স্বত্ব: অধিকার।

গান গাই

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী ‘আমরা সবাই রাজা’ গানটি সবাই মিলে গাও।

গান বুঝি

উপরের গানে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কিছু প্রশ্ন লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘আমরা সবাই রাজা’ গানটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

কবিতার সাথে গানের কী কী পার্থক্য আছে, দলে আলোচনা করে বের করো। গানের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

গান কী

কোনো একটা ভাব বা বিষয় নিয়ে গান রচিত হয়। কবিতার মতো গানও তাল দিয়ে পড়া যায়। গানেও এক লাইনের শেষ শব্দের সঙ্গে পরের লাইনের শেষ শব্দে মিল থাকে। তবে কোনো একটা মিল গানের মধ্যে বারে বারে ফিরে আসে।

কবিতা আবৃত্তি করা হয়; গান গাওয়া হয়। গানের সুর ও তাল ঠিক রাখার জন্য নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এর মধ্যে সুর ঠিক রাখার জন্য হারমোনিয়াম, পিয়ানো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়; অন্যদিকে তাল ঠিক রাখার জন্য তবলা, ঢোল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

যিনি গান লেখেন, তাঁকে বলা হয় গীতিকার। যিনি গানে সুর দেন, তাঁকে বলা হয় সুরকার। আর যিনি গান গেয়ে শোনান, তাঁকে বলা হয় গায়ক বা শিল্পী।

গল্প

গল্প পড়ি ১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘প্রাগৈতিহাসিক’ ইত্যাদি। নিচে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প দেওয়া হলো।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।



ম্যাজিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বানানো গল্প অনেক বলেছি। আজ একটা সত্য ঘটনার গল্প বলি। আপনা থেকে ঠিক জাদুকরি কৌশলে একটা ম্যাজিক ঘটে যাবার মজার গল্প।

ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যখন বাড়ি ফিরলাম, ছেলেমেয়েদের শোবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানের প্যাসেজে বসে সকলে চা জলখাবার খাচ্ছিল।

টুটুর মা বললেন, মেয়ে কী কাণ্ড করেছে জানো? সোনার চুড়িটা ভেঙে দু-টুকরো করেছে!

টুটু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, ইচ্ছা করে ভেঙেছি নাকি? পা পিছলে পড়ে গেলাম তো কী করব? আমার যে ব্যথা লাগল সেটা বুঝি কিছু নয়।

চুড়ি টুটুর মার, মেয়েকে পরতে দিয়েছিলেন। ঘরে আমি জামা ছাড়ছি, টুটুর মা উঠে এসে খাটের বালিশের তলা থেকে বার করে ভাঙা চুড়িটা দেখালেন। সমান দুটো টুকরো হয়ে গেছে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, দু-টুকরো হলো কী করে?

—কে জানে!

টুটুর মা টুকরো দুটো আবার বালিশের তলায় গুঁজে দিলেন।

বললাম, সোনাও বালিশের তলায় থাকবে! কাল-পরশু শুনব তো যে হারিয়ে গেছে?

—না না। তোমায় খেতে দিয়ে তুলে রাখব।

আমি ঘরের দরজার কাছে বসলাম। টুটুর মা আমায় খেতে দিলেন।

এবং খুব সম্ভব আমার খোঁচা আর দামি জিনিস হারাবার পুরানো অভিজ্ঞতা খেয়াল করে চুড়ির টুকরো দুটো তুলে রাখতে গেলেন।

প্রথমে বালিশের তলাটা হাতড়ালেন। তারপর তাড়াতাড়ি একটা একটা করে দুটো বালিশ তুলে অবাক হয়ে বললেন, ওমা! কী হলো চুড়িটা?

অবাক হবারই কথা। দু’তিন মিনিট আগে চুড়ির টুকরো দুটো বালিশের তলায় গুঁজে দিয়েছেন, এর মধ্যে আপনা থেকে শূন্যে মিলিয়ে গেল। সোনার চুড়ি ভেঙে টুকরো হলে তাদের পাখা গজায় নাকি?

বললাম, কী আর হবে, এখানেই আছে। খুঁজে দেখো।

বিছানার চাদর তুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে টুটুর মা খুঁজলেন। তারপর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর আমিও তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, মেঝেতে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে ভেবে খাটের তলা থেকে সমস্ত ঘর বাঁট দেওয়ালাম। কিন্তু কোথায় সোনার টুকরো!

তাজ্জব বানিয়ে দেবার মতোই ব্যাপার। বালিশের তলায় টুকরো দুটো রেখে টুটুর মা রান্নাঘরে গেলেন, আমি এসে বসলাম দরজার কাছে। এর মধ্যে কেউ ঘরেও ঢোকেনি, খাটের ধারে-কাছেও যায়নি।

বালিশে চাপা না থাকলেও বরং মনে করা চলত যে এক ফাঁকে জানলা দিয়ে কোনো পাখি ঘরে ঢুকে মুখে করে নিয়ে গেছে, কিম্বা হাঁদুর নিয়ে গেছে।

অদ্ভুত হলেও একটা মানে করা যেত টুকরো দুটোর এভাবে শূন্যে উড়ে যাবার!

টুটুর মা আমায় বললেন, তুমি নিশ্চয় তামাশা করছ! আমি রান্নাঘরে গেছি, সেই ফাঁকে সরিয়ে নিয়েছ।

আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যি নাওনি?

—না।

কাজ সারা জরুরি ছিল। কাজের ঘরে গিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসলাম—কিন্তু কাজ করব কী! কিছুতেই কাজে মন বসে না। এমন একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটে গেল, তার একটা মানে খুঁজে বার করতে না পারলে কি মানুষের স্বস্তি থাকে!

সোনাটুকু হারিয়েছে, হারাক। কিন্তু বালিশের তলা থেকে কী করে হারাল, না জানলে কি চলে?

কাজ বন্ধ করে কলম রেখে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলাম। এলোমেলো চিন্তা দিয়ে এ রহস্য ভেদ করা যাবে না। কী করে এ রকম ঘটতে পারে একে একে তার সমস্ত সম্ভবপর কথা ভাবতে হবে।

আমায় দেখিয়ে টুটুর মা যখন টুকরো দুটো আবার বালিশের তলায় রাখতে গেলেন তখন কোনো গোলমাল হয়নি তো?

ভাবতে গিয়েই আমার এমন হাসি পেল! খাটের উপর বিছানা, বিছানার এক মাথায় পাশাপাশি দুটো করে বালিশ—ওয়াড় দেওয়া বালিশ।

বালিশ দুটির তলে টুটুর মার চুড়ির টুকরো দুটি গুঁজে দেওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়েই রহস্য ভেদ হয়ে গেল!

টুটুর মাকে ডেকে বললাম, তোমরা এত খুঁজে পেলো না, আমি এই ঘরে বসে চুড়ি খুঁজে দিচ্ছি।

—কোথায় আছে?

—বালিশের ওয়াড়ের ভেতর খোঁজোগে যাও, পেয়ে যাবে!

সোজা ব্যাপার। তলার বালিশের ওয়াড়ের খোলা মুখের দিকটা ছিল ধারের দিকে। বালিশের তলা মনে করে টুটুর মা টুকরো দুটো রাখতে ওয়াড়ের মধ্যে হাত চালান করে দিয়েছিলেন!

খোঁজা হয়েছিল তন্ন তন্ন করে, শুধু বালিশের ওয়াড় খোঁজার কথা খেয়াল হয়নি। মানুষের সব দিক—খুব সোজা দিক পর্যন্ত—খেয়াল হয় না বলেই ম্যাজিক সম্ভব হয়েছে।

শব্দের অর্থ

ওয়াড়: বালিশের ঢাকনা।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা: খুব ভালো করে খোঁজা।

তাজ্জব বানিয়ে দেওয়া: অবাক করে দেওয়া।

তামাশা: মজা।

পাখা গজানো: উড়ে যাওয়া।

প্যাসেজ: ফাঁকা জায়গা।

রহস্য ভেদ হওয়া: অজানা বিষয় জানতে পারা।

শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া: অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

হাত চালান করা: হাত ঢুকিয়ে দেওয়া।

গল্প বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের গল্পে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘ম্যাজিক’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

‘ম্যাজিক’ গল্পের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

গল্প পড়ি ২

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় লেখক। তিনি ছোটো ছোটো বাক্যে সহজ-সরল শব্দে প্রচুর গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। ‘তোমাদের জন্য রূপকথা’, ‘নীল হাতি’, ‘বোতল ভূত’, ‘কানী ডাইনী’ ইত্যাদি তাঁর ছোটোদের জন্য লেখা বই। নিচের গল্পটি হুমায়ূন আহমেদের ‘পুতুল’ নামের বই থেকে নেওয়া।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।



পুতুল

হুমায়ূন আহমেদ

পুতুলের ঘর থেকে তাদের বাগানটা দেখা যায়। এত সুন্দর লাগে তার। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তাদের বাগান অন্যদের বাগানের মতো নয়। তিনটা বিশাল বড়ো বড়ো গাছ, একটা রেনট্রি গাছ। এত বড়ো যে মনে হয় এই গাছের পাতাগুলো আকাশে লেগে গেছে। আর দুটো হচ্ছে কদম ফুলের গাছ। কদম ফুলের গাছ দুটি পাশাপাশি যেন দুই জমজ বোন, একজন অন্যজনের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। বর্ষাকালে গাছ দুটিতে কী অদ্ভুত ফুল ফোটে। সোনার বলের মতো ফুল।

পুতুলের মা জেসমিন কদম ফুলের গাছ দুটি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। কারণ হচ্ছে শূঁয়োপোকা। কদম গাছে খুব শূঁয়োপোকা হয়। আর শূঁয়োপোকা দেখলেই জেসমিনের বমি পেয়ে যায়। তিনি প্রতি শীতকালে একবার করে বলেন— গাছগুলো কাটিয়ে ফেলা দরকার। শেষ পর্যন্ত কেন যেন কাটা হয় না। দেখতে দেখতে বর্ষা এসে যায়। অদ্ভুত কদম ফুলগুলো ফোটে। কী যে ভালো লাগে পুতুলের।

এখন শীতকাল। কদিন আগে ঠিক করা হয়েছে বড়ো বড়ো গাছগুলো সব কেটে ফেলা হবে। জেসমিন বজলু মিয়া বলে একটি লোককে ঠিক করেছেন। লোকটির মুখে বসন্তের দাগ। বজলু মিয়া গতকাল এসে বড়ো বড়ো গাছগুলো সব দেখে গেছে। দড়ি দিয়ে কী সব মাপ-টাপও নিয়েছে। বলে গেছে সোমবারে লোকজন নিয়ে আসবে।

পুতুলের এই জন্যেই খুব মন খারাপ। গাছগুলোর দিকে তাকালেই তার কান্না পেয়ে যায়। বাগানে এলেই সে এখন গাছগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে কী সব কথা বলে। হয়তো-বা সাব্বনার কোনো কথা। আজও তাই করছিল। গাছের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সে লক্ষ করল, তার বাবা বাগানে হাঁটছেন। তাঁর হাতে একটি ভাঁজ-করা খবরের কাগজ। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে খুব রেগে আছেন। খুব রেগে গেলে তিনি এ রকম গম্ভীর হয়ে যান। বাগানে কিংবা ছাদে মাথা নিচু করে হাঁটেন। পুতুলের মনে হলো আজ বোধহয় বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। এই একটা খারাপ ব্যাপার। দুদিন পরপর তাঁরা ঝগড়া করেন। ঝগড়া করবে ছোটোরা। আড়ি দেবে—ভাব নেবে। বড়োরা এ রকম করবে কেন?

পুতুল ছোটো ছোটো পা ফেলে রেনট্রি গাছটার দিকে যাচ্ছে। তার চোখ বাবার দিকে। বাবা কতটা রেগে আছেন সে বুঝতে চেষ্টা করছে। পুতুলের বয়স এগারো। এই বয়সের ছেলেরা চারদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে খুব বুঝতে চেষ্টা করে।

রহমান সাহেব পুতুলকে রেনট্রি গাছটার দিকে যেতে দেখলেন। কিছু বললেন না। তিনি জানেন, এই গাছের নিচে পুতুল প্রায়ই এসে বসে। এটা সম্ভবত পুতুলের কোনো গোপন জায়গা। সব শিশুদের কিছু গোপন জায়গা থাকে। তাঁর নিজেরও ছিল। পুতুলকে দেখে মাঝে মাঝে তাঁর নিজের শৈশবের কথা মনে হয়। তবে তিনি পুতুলের মতো নিঃসঙ্গ ছিলেন না। অনেক ভাইবোনের মধ্যে বড়ো হয়েছেন। তাঁদের বাড়িটা ছিল হৈ চৈ হল্লোড়ের বাড়ি। নিজের ভাইবোন ছাড়াও চাচাতো ভাইবোন, ফুপাতো ভাইবোন, পাড়ার ছেলেপেলে। সারাদিন চিৎকার চোঁচামেচি হৈ চৈ।

রহমান সাহেব রোদে পিঠ দিয়ে বসলেন। বসতে হলো ঘাসে। এমনভাবে বসেছেন যেন পুতুল কী করছে দেখা যায়। তিনি সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, পুতুল কী করে না—করে খবর রাখতে পারেন না। ছেলেটা খুবই একা। তাকে আরো কিছু সময় দেওয়া দরকার তা তিনি দিতে পারছেন না। তিনি মৃদু গলায় ডাকলেন-পুতুল!

‘জি বাবা।’

‘কী করছ তুমি?’

‘কিছু করছি না।’

‘কাছে এসো।’

পুতুল ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসছে। তিনি লক্ষ করলেন, পুতুলের খালি পা। অথচ তাকে অনেকবার বলা হয়েছে খালি পায়ে বাগানে না আসতে। গায়েও পাতলা একটা শার্ট ছাড়া কিছু নেই। শীতের সকাল বেলা পাতলা একটা জামা পরে কেউ থাকে? রহমান সাহেব খুব বিরক্ত হলেন। বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। ছেলেটা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। এ রকম হাসিমুখের একটি ছেলেকে ধমক দিতে মায়া লাগে।

‘তুমি প্রায়ই ওই রেনট্রি গাছটার নিচে বসে কী করো ওখানে?’

‘কিছু করি না। বসে থাকি।’

‘কিছু নিশ্চয়ই করো। শুধু শুধু কি কেউ বসে থাকে?’

পুতুল লাজুক ভজিতে হাসল। তার হাসি বলে দিচ্ছে সে শুধু শুধু বসে থাকে না। রহমান সাহেব বললেন, ‘বসে বসে ভাবো তাই না?’

‘হ্যাঁ ভাবি।’

‘কী নিয়ে ভাবো?’

পুতুল উত্তর না দিয়ে আবার লাজুক ভজিতে হাসল। রহমান সাহেবের ইচ্ছে করল ছেলেটাকে পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। মাথা-ভরতি রেশমের মতো চুল। দেখলেই হাত বোলাতে ইচ্ছে করে।

‘আজ তোমার শরীর কেমন?’

‘ভালো।’

‘কী রকম ভালো সেটা বলো—খুব ভালো, না অল্প ভালো—নাকি মন্দের ভালো।’

‘খুব ভালো!’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। যাও—যা করছিলে করো।’

পুতুল গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। মনে হচ্ছে তার কিছু বলার আছে। কিছু বলতে চাচ্ছে অথচ বলতে পারছে না। রহমান সাহেবের খানিকটা মন খারাপ হলো। এ তো বাচ্চা একটা ছেলে, সে কেন মনের কথাগুলো সহজভাবে বাবা-মাকে বলতে পারবে না। তিনি নরম গলায় বললেন, ‘পুতুল তুমি কি কিছু বলতে চাও?’

পুতুল মাথা নাড়ল। সে বলতে চায়। রহমান সাহেব বললেন—‘কী বলতে চাও বাবা?’

— গাছগুলো কেন কাটবে?

— গাছ কাটা তোমার পছন্দ নয়?

— না।

— ছোটোরা অনেক কাজ করে যেগুলো বড়োরা পছন্দ করে না। আবার ঠিক তেমনি বড়োরা অনেক কাজ করে যা ছোটোরা পছন্দ করে না। গাছগুলোতে শূঁয়োপোকা হয়, তোমার মা এই পোকাটা সহ্য করতে পারেন না।

পুতুল চুপ করে রইল। রহমান সাহেব বললেন—‘তাছাড়া আরেকটা কারণও আছে। গাছগুলোর জন্য ঘরে আলো-হাওয়া তেমন ঢুকতে পারে না। এখন দেখবে প্রচুর রোদ আসবে।’

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অন্যমনস্ক :	আনমনা।	রেনদ্বি :	শিরীষ গাছ।
আড়ি দেওয়া :	অভিমান করা।	লাজুক :	লজ্জিত।
গম্ভীর :	চুপচাপ।	শুঁয়োপোকা :	সারা গায়ে লোমযুক্ত এক ধরনের পোকা।
বসন্ত :	রোগের নাম।	শৈশব :	অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।
		হল্লোড় :	হড়াহড়ি।

গল্প বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের গল্পে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘পুতুল’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

‘পুতুল’ গল্পের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

গল্পের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

গল্প কী

গল্প এক ধরনের গদ্য রচনা, যেখানে কাহিনি ও চরিত্র থাকে। গল্পের কাহিনি সাধারণ ঘটনার চেয়ে একটু ভিন্ন হয়। এই কাহিনি বাস্তব জীবনে ঘটে এমন হতে পারে, আবার কল্পিতও হতে পারে। এদিক দিয়ে গল্প দুই ধরনের: বাস্তবের সাথে মিল আছে এমন গল্প এবং কাল্পনিক বিষয় নিয়ে রচিত গল্প। গল্প বইয়ের মতো বড়ো হয় না; অনেকগুলো গল্প নিয়ে একটা বই হতে পারে। যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদের গল্পকার বলে।

গল্প লিখি

নিচের ফাঁকা জায়গায় বানিয়ে বানিয়ে তুমি একটি গল্প লেখো। লেখার সময়ে গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রেখো। গল্পটির একটি নাম দাও।

১. কাহিনি আছে কি না।
২. চরিত্র আছে কি না।
৩. সংলাপ আছে কি না।
৪. গদ্যভাষায় লেখা কি না।
৫. এর কাহিনি সাধারণ ঘটনার চেয়ে ভিন্ন কি না।

০৪র্থ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ পড়ি

কামরুল হাসান বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী। তিনি ‘পটুয়া কামরুল হাসান’ নামে পরিচিত ছিলেন। নিচের প্রবন্ধটি কামরুল হাসানের লেখা। এটি তাঁর ‘আমাদের লোককৃষ্টি’ বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রবন্ধটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।



আমাদের লোকশিল্প

কামরুল হাসান

খাদ্যশস্যের পরেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা হলো এখানকার কুটিরশিল্প। এক সময়ে ঘর-গৃহস্থালির নিত্য ব্যবহারের প্রায় সব পণ্য এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো। আজও অনেক কিছুই হয়। এগুলো কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য।

আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের কতকগুলো এক সময়ে এমন উচ্চমানের ছিল যে, আজও আমরা সেসব জিনিসের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি।

প্রথমে বলতে হয় ঢাকাই মসলিনের কথা। ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকার তাঁতিদের এ অমূল্য সৃষ্টি এক কালে দুনিয়া জুড়ে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন। ঢাকার মসলিন তৎকালীন মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল। মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বোনা হতো যে, ছোট্ট একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে কয়েক শ গজ মসলিন কাপড় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল।

এক সময়ে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে নকশিকাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল। একেকটি সাধারণ আকারের নকশিকাঁথা সেলাই করতে কমপক্ষে ছয় মাস লাগত। বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া যায় না, এমন মৌসুমই ছিল নকশিকাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময়। মেয়েরা সংসারের কাজ সাঁজ করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন বিচিত্র নকশা তোলা কাঁথা সেলাই করতে। শুধু কতকগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রং-বেরঙের নকশার জন্যই নকশিকাঁথা বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সুচের ফাঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে একেকটি পরিবারের কাহিনি, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা।



নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে।

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দেরর সমাদর শুধু গ্রামজীবনেই নয়, শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে। খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর সবটাই হাতে প্রস্তুত। তুলা থেকে হাতে সুতা কাটা হয়। গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে সুতা কাটে। এদের বলা হয় কাটুনি। গ্রামে বাড়ির আশপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে। সেই গাছের তুলা দিয়ে সুতা কাটা ও হস্তচালিত তাঁতে এসব সুতায় যে কাপড় প্রস্তুত করা হয়, সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর। রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরী মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্তু বুনে থাকে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। নকশা, রং ও বুননকৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।



বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আজও শত শত গ্রাম্য কারিগর তৈরি করে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র। প্রথমে মাটির ছাঁচ করে তার মধ্যে ঢেলে দেয় গলিত কাঁসা। ধীরে ধীরে এ গলিত ধাতু ঠান্ডা হয়ে আসে। তখন ওপর থেকে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেললেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা ইত্যাদি। তারপর এগুলো পালিশ করা হয়। এ ধরনের বাসনে নানা রকম ফুল পাতার নকশা বা ফরমাশকারীর নাম খোদাই করা থাকে। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে তামা-পিতলের ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এ দেশে বহু যুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, রসের তিলা, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল ইত্যাদি গড়বার কাজে বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমোরপাড়ার অধিবাসীরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট, কৌটা, বাক্স বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সব কিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের গায়ে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায় তা এদেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

খুলনার মাদুর এবং সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। এ শিল্পীদের দিয়ে এককালে ঢাকার নবাব পরিবার হাতির দাঁতের শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকার জাদুঘরে তা সংরক্ষিত আছে।



আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা, হাতপাখা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। সাধারণ সামগ্রী হলেও যাঁরা এগুলো তৈরি করেন তাঁদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্য দিয়ে। বাঁশের নানা রকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না। ছোটোখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক রুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া শোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনাও দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে।

কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। এগুলো যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশি পয়সাও উপার্জন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

(পরিমার্জিত)

শব্দের অর্থ

অনায়াসে :	সহজে।	প্রতীকধর্মী :	যা কোনো বিষয়কে ইজিত করে।
অপরিহার্য :	আবশ্যিক।	ফরমাশকারী :	যিনি আদেশ করেন।
অমূল্য :	মূল্য দিয়ে যার বিচার করা যায় না।	মৌসুম :	কাল, ঋতু।
ঐতিহ্য :	অতীত কালের গৌরবের বস্তু।	রেওয়াজ :	প্রচলন।
খোদাই করা :	খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঁকা।	লোকশিল্প :	হাতে তৈরি শিল্পসামগ্রী।
ঘড়া :	কলসি।	শহরতলি :	শহরের কাছাকাছি এলাকা।
জীবনগাথা :	জীবনের গল্প।	সংরক্ষণ :	রক্ষা করা।
টেকসই :	মজবুত।	সম্প্রসারণ :	প্রসারিত করা।
টোপর :	মাথার মুকুট।	সহজাত :	স্বাভাবিক।
ঠিলা :	মাটির কলসি।	সানকি :	মাটির থালা।
দারিদ্র্য :	গরিব অবস্থা।	সুপরিকল্পিত :	ভালোভাবে পরিকল্পনা করা।
নিবিড় :	ঘনিষ্ঠ।	সুরুচিপূর্ণ :	বুচিশীল।
পণ্য :	বিক্রি করা যায় এমন জিনিস।	সৌন্দর্যপ্রিয়তা :	সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা।
		হস্তচালিত :	হাতে চালানো।

প্রবন্ধ বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের প্রবন্ধে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘আমাদের লোকশিল্প’ প্রবন্ধটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

উপরে একটি প্রবন্ধ পড়েছ। প্রবন্ধের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

প্রবন্ধ কী

গদ্যভাষায় কোনো বিষয়ের সুবিন্যস্ত আলোচনাকে প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ অনেক রকমের হয়; যেমন: বিবরণমূলক প্রবন্ধ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ অনেকগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকে। অনুচ্ছেদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। কী বিষয়ে আলোচনা হবে শুরুর অনুচ্ছেদে তার ইঙ্গিত থাকে; শেষ অনুচ্ছেদে লেখকের মতামত ও সিদ্ধান্ত থাকে। যাঁরা প্রবন্ধ লেখেন, তাঁদের প্রাবন্ধিক বলে।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়। প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি।

প্রবন্ধ লিখি

কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করো। বিষয়টির কোন কোন দিক নিয়ে আলোচনা করবে, তা নিয়ে ভাবো। কয়েকটি অনুচ্ছেদে গদ্যভাষায় তোমার ভাবনাকে উপস্থাপন করো। লেখার শুরুতে ভূমিকা ও লেখার শেষে উপসংহার থাকবে। মাঝখানের অনুচ্ছেদগুলোতে তোমার বক্তব্য একের পর এক সাজিয়ে লিখবে। একেবারে উপরে প্রবন্ধের একটি শিরোনাম লেখো।

যাচাই করি

তোমার লেখা প্রবন্ধে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না, যাচাই করে দেখো।

১. গদ্যাভাষায় রচিত কি না।
২. নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে লেখা কি না।
৩. ভূমিকা আছে কি না।
৪. উপসংহার আছে কি না।
৫. তথ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো কি না।

স্টার্ট

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ থেকে ‘সুখী মানুষ’ নাটকটি আবার পড়ো।

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘সুখী মানুষ’ নাটকে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

‘সুখী মানুষ’ নাটকটির কাহিনি প্রথমে গল্পের মতো করে বলো, তারপর লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

‘সুখী মানুষ’ নাটকের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

নাটকের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

নাটক কী

অভিনয়ের উপযোগী করে লেখা সংলাপ-নির্ভর রচনাকে নাটক বলে। নাটকে একজন অন্যজনের সাথে যেসব কথা বলে, সেগুলোকে সংলাপ বলে। আর সংলাপ যাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তাদের বলে চরিত্র। সংলাপের মাধ্যমে নাটকের কাহিনি এগিয়ে যায়। যাঁরা নাটক লেখেন তাঁদের নাট্যকার বলে।

নাটকে বিভিন্ন ভাগ থাকে; একে বলে দৃশ্য। নাটক যেখানে অভিনয় করা হয়; সেই জায়গাকে বলে মঞ্চ। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের বলে অভিনেতা।

অভিনয় করি

শিক্ষকের নির্দেশনায় ‘সুখী মানুষ’ নাটকটির অভিনয় করো।

০৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যের নানা রস

কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক—এগুলো সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রতিটি রূপের বৈশিষ্ট্য আলাদা। নিচের ছকে তুলনা করার জন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আছে। টিকচিহ্ন অথবা ক্রসচিহ্ন দেওয়ার মাধ্যমে তোমরা ছকটি পূরণ করো। এর ফলে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

ক্রম	বৈশিষ্ট্য	কবিতা	গান	গল্প	প্রবন্ধ	নাটক
১	মিলশব্দ					
২	তাল					
৩	নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের লাইন					
৪	সুর					
৫	পদ্য-ভাষা					
৬	গদ্য-ভাষা					
৭	কাহিনি					
৮	চরিত্র					
৯	বিষয়					
১০	অনুচ্ছেদ					
১১	সংলাপ					
১২	অভিনয়					

সাহিত্যের রূপ বুঝি

উপরের ছকটি পূরণের মাধ্যমে কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক—এগুলোর যেসব বৈশিষ্ট্য পেয়েছ, তার ওপর ভিত্তি করে নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লেখো।

কবিতা

গান

গল্প

প্রবন্ধ

নাটক



দেয়াল-পত্রিকা বানাই

আগের পরিচ্ছেদগুলোতে তোমরা গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতে শিখেছিলে। তখন তোমরা যেসব গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ বানিয়ে বানিয়ে লিখেছিলে, সেগুলো নিয়ে দেয়াল-পত্রিকা তৈরি করো। এ কাজের জন্য শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতি দল থেকে একটি করে দেয়াল-পত্রিকা তৈরি হবে।